ছবি ৭.২২:
মুঘল কারখানায় বই অলংকরণের কাজ করছেন শিল্পীরা।

সম্রাট আকবরের সময়ে বইয়ের অলংকরণ শিল্পের আরও নমুনা পাওয়া যায়। *তুতিনামা*, *রজমনামা* (মহাভারতের ফারসি অনুবাদ) প্রভৃতি বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা সাজানো হতো সূক্ষ্ম হস্তলিপি এবং ছবি দিয়ে। আকার এবং আয়তনে ছোটো এই ছবিগুলিকে বলা হয় মিনিয়েচার (Miniature)। মিনিয়েচার কথাটা ইংরাজি, তবে সেটাই বেশি প্রচলিত। বাংলায় তাকে অণুচিত্র বলা যেতে পারে। সোনার রং এবং অন্যান্য রঙের ব্যবহার হতো বইতে। তাতে জ্বলজ্বল করত পৃষ্ঠাগুলি। লেখার চারপাশে নানারকম অলংকরণ করা হতো।

বই অলংকরণের পাশাপাশি প্রতিকৃতি আঁকাও আকবরের সময় থেকে শুরু হয়। জাহাঙ্গিরের আমলে প্রতিকৃতি আঁকার উন্নতি হয়। সে সময়ে থেকেই ইউরোপীয় ছবি আঁকার রীতি-নীতির ছাপ মুঘল চিত্রশিল্পে পড়েছিল। ছবিতে বাস্তবতা ও প্রকৃতিবাদ এর ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। ভারতের প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণী ছবির বিষয়বস্তু হিসাবে উঠে আসে।

ছবি ৭.২৩ :

বাদশাহ জাহাঙ্গিরের হাতে পৃথিবীর ভার (সার্বভৌম ক্ষমতা) তুলে দিচ্ছেন বাদশাহ আকবর। উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পাওয়ার প্রতীক এই কাল্পনিক ছবিটি।

জাহাঙ্গিরের আমলেই শিল্পীরা প্রথম ছবিতে স্বাক্ষর (সই) করতে শুরু করেন। তাতে বোঝা যেত কোন ছবি কার আঁকা।

বাদশাহি বা অভিজাত নারীরা অনেকেই ছবি আঁকার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তবে বাইরের শিল্পীদের দিয়ে অন্দরমহলের মহিলাদের ছবি আঁকানোর বিশেষ প্রচলন ছিল না। নাদিরা বানু, সাহিফা বানুর মতো মুঘল-নারীরা নিজেরাও ছবি আঁকতেন।

স্থাপত্যের পাশাপাশি শাহ জাহানের চিত্রশিল্পেও উৎসাহ ছিল। ছবির মধ্যে কাছে-দূরে বোঝানোর পদ্ধতির ব্যবহার এই সময়ে শুরু হয়। *পাদশাহনামা* গ্রন্থের অলংকরণ এই সময়ের বিখ্যাত কাজ। এইসব ছবিগুলি শিল্প হিসাবে অসাধারণ। অন্যদিকে সমকালীন ইতিহাসেরও উপাদান হয়ে উঠেছে ছবিগুলি।

শাহজাহানের পরে মুঘল চিত্রশিল্পের উন্নতি বড়ো একটা দেখা যায় না। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে দরবারি শিল্পীদের কাজ ব্যাহত হয়। তাদের অনেকেই মুঘল দরবার ছেড়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকদের দরবারে চলে যান। বাদশাহ, অভিজাতরাই বিষয়বস্তু হিসাবে মুঘল দরবারি ছবিগুলিতে বেশি ছাপ রেখেছিল। তবে তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, তাদের কাজকর্মও ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছিল।

টুকরো কথা

মুঘল চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আবুল ফজলের বিবরণ

"মনে করা হয় যে, সাদা এবং কালো সব রঙের উৎস। এ-দুটিকে দেখা হয় পরস্পর বিরোধী রং হিসেবে এবং অন্যান্য রঙের অংশরূপে। তার ফলে যখন অনেকটা পরিমাণে সাদা মেশানো হয় কিছুটা ভেজাল কালোর সঙ্গে, উৎপন্ন হয় হলুদ রং। সাদা ও কালো সমান পরিমাণে মেশালে আসে লাল। যখন অনেকটা বেশি পরিমাণে কালো রঙের সঙ্গে মেশানো হয় সাদা, পাওয়া যায় নীলচে সবুজ। এদেরকে মিশিয়েই অন্যান্য রঙও পাওয়া সম্ভব ..." — আবুল ফজল আল্লামি, *আইন-ই আকবরি*, আইন ৩৪ ('রঙের চরিত্র প্রসঙ্গে')।

কোনো কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য মিলিয়ে ছবি আঁকাকে বলে *তসভির*। বাদশাহ আকবর তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই এই ধরনের ছবি আঁকার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমলে বহু চিত্রকরপরিচিতি পায়। প্রতি সপ্তাহে দারোগা ও কেরানিরা সমস্ত চিত্রকরদের ছবি বাদশাহের সামনে পরিবেশন করত। তিনি তখন ছবির শৈল্পিক গুণের বিচার করে পুরস্কার ঘোষণা করতেন বা বাড়িয়ে দিতেন তাদের মাস মাইনে।

ছবি ৭.২৪:
চিত্রনন্দ ও উদীয় নামের দুটি যুদ্ধের হাতি লড়াই করছে।
***আকবরনামা*–র একটি মুঘল মিনিয়েচার।**

মুঘল শিল্পীদের ছবিতে যেন প্রাণহীন বস্তুও প্রাণ পায়। একশোর বেশি চিত্রকররা হয়ে উঠেছিলেন ছবি আঁকায় অতুলনীয়।

এই শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পারস্যের তাবরিজের **মির সঈদ আলি**, সিরাজের **খোয়াজা আবদুস সামাদ** যাঁর ছদ্মনাম ছিল 'শিরিন কলম' অর্থাৎ মিষ্টি কলম, **দসবন্ত** এবং **বসওয়ান**। দসবন্ত ছিল এক পালকি বাহকের ছেলে। তাঁর সমস্ত জীবন নিবেদিত ছিল এই শিল্পে। আঁকতে সে এতই ভালোবাসত যে দেয়ালেও এঁকে ফেলত মানুষের ছবি। স্বয়ং বাদশাহের সুনজরে পড়েন দসবন্ত। কালক্রমে আঁকার দক্ষতায় বাকি সব শিল্পীদের সে ছাড়িয়ে যায়। অকালে তার মৃত্যু হলেও দসবন্তের ছবিগুলো তাঁর প্রতিভার সাক্ষী। ছবির পটভূমিকা বা নানান অবয়ব আঁকতে, রঙের ব্যবহারে, প্রতিকৃতি আঁকাতে বা অন্যান্য বহু শাখায় বসওয়ানের দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

আঞ্চলিক চিত্রকলা

মুঘলদের দরবারি চিত্রশিল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক ছবি আঁকার রীতি দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৮৬-১৬২৭খ্রিঃ) চিত্রশিল্পের সমঝদার ছিলেন।

রাজস্থান এবং পাহাড়ি অঞ্চলে (জম্মু, কাশ্মীর, কাংড়া প্রভৃতি) নানান ছবি আঁকার রীতি দেখা যায়। মুঘল রীতি ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এই আঞ্চলিক চিত্ররীতিগুলিতে মিলেমিশে গেছে। ছবির বিষয়, রঙের ব্যবহারের দিক থেকে এদের আলাদা মর্যাদা।

পৌরাণিক নানা দৃশ্য এবং বিষয় এই ছবিগুলির মূলকেন্দ্র ছিল। বিষয়বস্তু হিসাবে রাধা-কৃষ্ণের খুব ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি প্রতিকৃতি আঁকার চর্চাও জনপ্রিয় ছিল। রাজপুত রাজারা ছাড়াও জমিদাররাও নিজেদের এবং তাঁদের সভার ছবি আঁকাতেন। তবে এই প্রতিকৃতিগুলির পটভূমি অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা ছিল।

টুকরো কথা

'জগতের বিস্ময়'

বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ-র সময়ে সেরা চিত্রশিল্পী ছিলেন ফারুক হোসেন। তিনি প্রথমে মুঘল সম্রাট আকবরের কারখানায় যোগ দেন। ১৫৯০ থেকে ১৬০৫খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফারুখ হোসেন হঠাৎ মুঘল কারখানা থেকে উধাও হয়ে যান। মনে করা হয়, এই সময়েই তিনি ইব্রাহিমের জন্যে ছবি আঁকতেন। পরে হোসেন আবার মুঘল কারখানায় ফিরে যান। জাহাঙ্গির তাঁকে নাদির আল-অস্‌র (জগতের বিস্ময়) উপাধি দেন।

ছবি ৭.২৫: আলোচনারত রাধা–কৃষ্ণ, কাংড়া চিত্র।

সংগীত ও নৃত্য

সুলতানি এবং মুঘল আমলে সংগীত এবং নৃত্য শিল্পের চর্চাও হতো। ভারতবর্ষের সংগীত চর্চা আর ইরানি সংগীতচর্চার ধারা মিলেমিশে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই সুফি পিররা *সমা* গানকে তাঁদের সাধনার অংশ করে তোলেন। পাশাপাশি ভক্তিধর্মের হাত ধরেও নানান আঞ্চলিক সংগীতচর্চা গড়ে ওঠে। কবীর, নানক, মীরাবাঈ সকলেই গানকে তাঁদের ঈশ্বর সাধনার অংশ করে নিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে কীর্তনের মাধ্যমেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার হতো।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা জারি ছিল। সেই সময়ের দুটি বই থেকে এবিষয়ে জানা যায়। আঞ্চলিক রাজ্যগুলিও সংগীতচর্চার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। সংগীত বিষয়ে লেখা বই অনেক সময়ে রাজা, সুলতানদের উৎসর্গ করা হতো। জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শরকিকে *সংগীত শিরোমণি* (১৪২০ খ্রিস্টাব্দ) রচনাটি উৎসর্গ করা হয়। হোসেন শাহ শরকি নিজে সংগীত রাগ তৈরি করেছিলেন। তাকে হোসেনি বা জৌনপুরি রাগ বলে।

গোয়ালিয়রের রাজা মান সিং তোমর (১৪৫০-১৫২৮খ্রিঃ) ছিলেন সংগীতের সমঝদার। তাঁর সময়ে শাস্ত্রীয় ধ্রুপদগুলি সংস্কৃত থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়। *মান-কৌতূহল* সেই সময়ের একটি বিখ্যাত সংগীত গবেষণা গ্রন্থ। বৈজু বাওরা এই আমলের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী।

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সেরা সংগীতপ্রেমী ছিলেন আকবর। তাঁর দরবারের গুণীজনদের মধ্যে সংগীতজ্ঞরাও ছিলেন। আবুল ফজলের লেখায় ছত্রিশজন সংগীতশিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তানসেন (১৫৫৫-১৬১০খ্রিঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তাঁর সৃষ্টি দীপক, মেঘমল্লার প্রভৃতি রাগ। শোনা যায় যে, তাঁর সংগীত সাধনা এমনই ছিল যে, তাতে নিজে থেকে প্রদীপ জ্বলে উঠত, কখনওবা অকালে বর্ষা নামত।

শাহজাহানের সময়েও মুঘল দরবারে সংগীতের প্রচলন ছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের প্রথম দশ বছর সংগীতশিল্পে উৎসাহী ছিলেন। তারপর সরকারি ভাবে সংগীতের পৃষ্টপোষণা বন্ধ হয়ে যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পরেও সংগীতের ঐতিহ্য বজায় ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসক সংগীতের সমঝদার ছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সেই ঐতিহ্য আজও চলেছে।

টুকরো কথা

আমির খসরু

সুলতানি আমলে আমির খসরু হিন্দুস্তানি এবং ইরানি সংগীতের মিলন ঘটান খসরু। দিল্লির সুলতান থেকে সুফি পির--- খসরুর জনপ্রিয়তা ছিল সবাইয়ের কাছে। আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য জয়ের পরে কর্ণাটকী সংগীত শিল্পীরা দিল্লিতে এলে তাদের কাছেই আমির খসরু ভারতের প্রাচীন সংগীতচর্চার ব্যাকরণ শেখেন। শাস্ত্রীয় সংগীত বিষয়ে খসরুর অনেক লেখাও আছে। খেয়াল, তরানা, কওয়ালি প্রভৃতি সংগীতরীতি আমির খসরুর সৃষ্টি। মনে করা হয় সেতার, তবলা, পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রগুলিও তাঁর বানানো। এ ছাড়া আমির খসরু অনেক গজল এবং গীতিকাব্য লিখেছিলেন।

নৃত্যশিল্প : মণিপুরী নৃত্য

ভারতবর্ষে ধ্রুপদী নাচ মূলত ছ-টি : ভরতনাট্যম, কথাকলি, ওড়িশি, কুচিপুড়ি, কত্থক এবং মণিপুরী। তারমধ্যে নবীনতম মণিপুরী নৃত্যশৈলীর কথা আমরা জানব। অষ্টাদশ শতকে ভক্তির প্রবল প্রভাব পড়ে মণিপুরী সংস্কৃতিতে। তার ফলে তাদের আদি নৃত্য ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় ভক্তিরস। সৃষ্টি হয় সংকীর্তন এবং রাসলীলা। বৈষ্ণব পদাবলির ভিত্তিতে রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রাসলীলাগুলি তৈরি করা হয়।

ছবি ৭.২৬:
মণিপুরী নৃত্যের একটি ভঙ্গিমার আঁকা ছবি।

মণিপুরের মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের হাতেই মণিপুরী রাসলীলার ধারাগুলির বিকশিত হয়। নাচের জন্য কুমিল পোশাকও তিনি তৈরি করেন। সংকীর্তনে পুঙ্গ নামের ঢোল বাজিয়ে মূলত ছেলেরাই নাচে।

৭.৭ ভাষা ও সাহিত্য

৭.৭.১ আরবি ও ফারসি

ইসলামের জন্ম আরব দেশে। তাই তার প্রচলন আরবি ভাষার মাধ্যমেই। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কিন্তু আরবি ভাষার প্রচলন ছিল সীমিত। আরবির কদর ছিল কেবল ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে। বেশ কিছু সরকারি বই আরবি ভাষায় লেখা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে লেখা *ফতাওয়া-ই আলমগিরি*। এটি তখনকার আইন ব্যবস্থার একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল। এটিকে কেউ কেউ ভারতে মুসলিম শাসনে লেখা শ্রেষ্ঠ মুসলমানি আইনের বই বলে থাকেন।

মধ্যযুগের ভারতে বরং আমরা দেখি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল জনপ্রিয়তা। ভারতে ফারসি সাহিত্যের শুরু সুলতানি শাসনের হাত ধরে।

দশম শতাব্দীতে তুর্কিরা যখন ভারতে আসে তখন থেকেই বোধ হয় ফারসির প্রচলন ঘটে। এর আগে থেকেই অবশ্য ফারসি প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে মধ্য এশিয়া এবং ইরানে প্রচলিত ছিল। সেখানে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই ভাষা বহুভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর থেকে ভাবা হয়তো ভুল নয় যে তুর্কিরা ফারসি ভাষার শক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিল। হয়তো সেই কারণেই ভারতে এই ভাষাকে গুরুত্ব দেয় তুর্কিরা। কুতবউদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিশ ফারসি ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে খলজি যুগের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই লাহোর শহর হয়ে ওঠে ফারসি ভাষাচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

সেসময় ফারসি সাহিত্যিক এবং দার্শনিকদের মধ্যে আমির খসরুর লেখা ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। ১২৫২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের বদাউনের কাছে পাটিয়ালিতে জন্ম খসরুর। তিনি চিরকাল তাঁর ভারতীয়ত্বের গর্ব করতেন। খসরুর এরকম ভারত-প্রীতি থেকে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়। তা হলো, কীভাবে ধীরে ধীরে তুর্কি শাসকরা তথাকথিত আক্রমণকারীর ভূমিকা বদলে এ দেশে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার মানসিকতায় পৌঁছে গিয়েছিল। খসরু অনেক কবিতা ও কাব্য লেখেন। সারাজীবন ফারসি কাব্য লেখার নানান পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যান তিনি। খসরু ফারসি সাহিত্যের এক নতুন রচনাশৈলী *সবক-ই হিন্দ* -এর আবিষ্কারক।

এ সময়ে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রেও ফারসি হয়ে ওঠে অতি পছন্দের ভাষা। এই ভাষার বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা ছিলেন মিনহাজ- ই সিরাজ, ইসামি এবং জিয়াউদ্দিন বারনি। মধ্যযুগে বহু রচনা মূল সংস্কৃত থেকে ফারসিতে অনুবাদ করা হয়। এই ধারার প্রথম লেখক ছিলেন জিয়া নকশাবি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা গল্পমালা ফারসিতে অনুবাদ করেন। তার নাম দেন *তুতিনামা*। এ ছাড়াও সে সময়কার কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল আবেদিনের উৎসাহে কলহন-এর *রাজতরঙ্গিনী* এবং *মহাভারত* ফারসিতে অনুবাদ করা হয়।

ফারসিতে অনুবাদের এই রেওয়াজ সমানভাবে চলতে থাকে তুঘলক, সৈয়দ ও লোদি আমলেও। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে তার রাজধানী কিছু সময়ের জন্য দেবগিরি বা দৌলতাবাদে চলে যায়। তার ফলে দক্ষিণ ভারতে ফারসি চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের বাহমনি সুলতানেরাও ছিলেন ফারসি ভাষা চর্চায় খুব আগ্রহী। সেই কারণে বাহমনি-রাজধানী গুলবর্গা এবং বিদর হয়ে উঠেছিল ফারসি ভাষা এবং সাহিত্যের এক নামি কেন্দ্র।

মনে রেখো

কুতুবউদ্দিন আইবকের সময়ের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন হাসান নিজামি। তাঁর লেখা ইতিহাসের নাম তাজ-উল মাসির। সেই বইতে নিজামি লিখেছেন— 'সব যুদ্ধ জয়ের পরেই চলতি প্রথা ছিল বিরোধীদের দুর্গ ও অন্যান্য ঘাঁটি গুলি বিশাল হাতিদের পায়ে পিষে গুঁড়ো করে দেওয়া।'

শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর সব দেশেই জয়ীরা পরাজিতদের সব শক্তি শেষ করার জন্য এসব করত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রিস্টান সব ধর্মের শাসকরাই একাজ করেছেন। এটা আসলে রাজনৈতিক শক্তি দেখানোর একটা চেষ্টা।

ফারসির কার্যকারিতা এবং জনপ্রিয়তা আরো বেড়েছিল মুঘল আমলে। সম্রাট বাবর ছিলেন তুর্কি এবং ফারসি দুই ভাষাতেই সুপণ্ডিত। তাঁর আত্মজীবনী *তুজুক-ই বাবরি* বা *বাবরনামা* লেখা হয়েছিল তুর্কি ভাষাতে। এই বইটি ফারসিতেও অনূদিত হয়েছিল। হুমায়ুনও ছিলেন ফারসিপ্রেমী। গুলবদন বেগমের লেখা *হুমায়ুননামা* ফারসি ভাষায় লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ইরান থেকে যখন ভারতে ফেরেন সম্রাট হুমায়ুন, তাঁর সঙ্গে আসেন বহু কবি-সাহিত্যিক। যেমন কাসিম খান মৌজি। ইনি ছিলেন হুমায়ুন এবং আকবরের সভাকবি। খ্রিস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পারস্য থেকে বহু কবি এবং সাহিত্যিক এসে মুঘলদের দরবারে ভিড় জমান। পারস্যের সফাবি সাম্রাজ্য তখন পতনের মুখে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ওখানকার গুণী মানুষজন চলে আসে ভারতে। পারস্য এবং ভারতের এক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘটেছিল ফারসি ভাষার মধ্য দিয়ে। এতে বিশেষ লাভ হয় ভারতীয় সাহিত্যের। এক বিশিষ্ট কাব্যরীতির জন্ম হয় ফৈজি, উরফি, নাজিরি, বেদিলের মতো কবিদের লেখায়।

সম্রাট আকবরের আমলে ফারসি ভাষা এবং সাহিত্য ক্রমশ উন্নত হতে থাকে। তাঁর সময়ের রচনাগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হলো ইতিহাস লেখা। দ্বিতীয়টি অনুবাদ সাহিত্য। তৃতীয়টি ছিল কবিতা। ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে ছিল আবুল ফজলের *আকবরনামা* এবং *আইন-ই আকবরি*, বদাউনির *মুন্তাখাব-উৎ তওয়ারিখ* এবং নিজামউদ্দিন আহমেদের *তবকাত-ই আকবরি* ইত্যাদি।

আকবরের মতো সম্রাট জাহাঙ্গিরও ফারসির অনুরাগী ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ভারতের নামি কবি ছিলেন তালিব আমুলি। শাহ জাহানের সময়েও এই চর্চা সমানভাবে চলতে থাকে। এর প্রমাণ আবদুল হামিদ লাহোরির মতো বিখ্যাত ঐতিহাসিকের লেখা। ফারসিতে অনুবাদের এই ধারা একেবারে কমে আসে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। মনে করা হয় যে, তিনি পারস্যদেশ থেকে আসা কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি তেমন সদয় ছিলেন না। তবে ঔরঙ্গজেবের কন্যা জৈবউননিসা আরবি এবং ফারসি ভাষা ভালোবাসতেন ও তাতে কবিতাও লিখতেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব নিজেও এই ভাষা ভালোমতোই জানতেন। তার প্রমাণ ফারসিতে লেখা তাঁর কিছু চিঠিপত্র।

উপরের আলোচনা থেকে তোমরা যদি ভাবো যে, ফারসি ভাষা শুধু মুসলমান সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল— তবে তা ভুল হবে। অন্যরাও এই ভাষায় সমান পটু ও আগ্রহী ছিল। এর প্রমাণ রয়ে গেছে ঈশ্বরদাস নাগর, চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ বা ভীমসেন বুরহানপুরির মতো হিন্দু লেখকদের রচনা।

টুকরো কথা

আকবরের আমলে অনুবাদ

অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আকবরের নিজের উৎসাহে কয়েকজন লেখক মহাভারতের নানান অংশ ফারসিতে অনুবাদ করে। রজমনামা নামে সেটি বিখ্যাত। বদাউনি করেছিলেন রামায়ণের অনুবাদ। হাজি ইব্রাহিম সিন্ধি ফারসি ভাষায় বেদের অনুবাদ করেন। গ্রিক ভাষায় লেখা বেশ কিছু বইও ফারসিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। রাজা টোডরমল ভাগবৎপুরাণ অনুবাদ করেন ফারসিতে।

৭.৭.২ বাংলা সাহিত্য

সুলতানি আমলের গোড়ার দিকে কেমন ছিল বাংলা ভাষা তার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে সেই সময়কার কিছু পুঁথি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এর ভাষা থেকে সুলতানি আমলের বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যেতে পারে।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে ইলিয়াসশাহি শাসন শুরু হলো বাংলায়। সেই সময় থেকে বাংলা ভাষায় লেখালেখির উদাহরণ পাওয়া যায়। ঐ ধারা বাকি সুলতানি এবং মুঘল আমলে বজায় ছিল।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক পর্যন্ত কেমন ছিল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য? আজকের মতো তখনও বাংলা ভাষা ছিল নানা রকম। তখনকার সাহিত্যে দেবদেবীর মহিমা প্রচারের ছাপ ছিল; কিছু কিছু গীতিকায় সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিও ধরা থাকত।

যা লেখা হতো, তার বেশিরভাগই সুর করে গাওয়া হতো। তাই এই সময়ের অনেক লেখালেখিকে *পাঁচালি* বলা হয়। রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ বা দেবদেবীর পাঁচালি সবই গাওয়ার রেওয়াজ ছিল।

ভক্তিধর্মের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে খুব গভীর। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর বৈষ্ণব-ভক্তিবাদ নিয়ে অনেক সাহিত্য লেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে কাব্য লেখার চল ছিল। তার পাশাপাশি ছিল রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে পদ-কবিতা লেখার ধারা। তাকেই বলে পদাবলি সাহিত্য।

রামায়ণ, মহাভারত সেই সময়েও খুব জনপ্রিয় ছিল। ঐ দুই মহাকাব্যের নানা দিক নিয়ে অনেকেই এই সময়ে কাব্য লিখেছিলেন। তাছাড়া রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ তো ছিলই। *রামায়ণ* অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। কাশীরাম দাস *মহাভারত*-এর অনুবাদ করেছিলেন। ভাগবত-এর খানিক অংশ সে যুগের সরল বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল। সেই অনুবাদটির নাম *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। অনুবাদটি করেন মালাধর বসু।

বাংলা সাহিত্যের আরেকটি পুরোনো এবং প্রধান ধারা ছিল *মঙ্গলকাব্য*। চণ্ডী, মনসা, ধর্ম এইসব দেব-দেবীর পুজোর চলনতো ছিলই। সেই পুজোর সময়ে ঐ দেব-দেবীর মহিমা শোনানো হতো গান গেয়ে। সেই গানগুলোর ভিতরে একটা গল্প থাকত। সেই গল্পগুলোকে ধরে বেশ কিছু সাহিত্য লেখা হয়। সেগুলোকেই মঙ্গলকাব্য বলে। 'মঙ্গল' মানে 'ভালো'। যে দেবতা বা দেবীর নামে মঙ্গলকাব্য লেখা হতো, তার পুজো করলে ভালো হবে—সেটাই

টুকরো কথা

মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদ

রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত সবগুলোই আসলে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কিন্তু, যখনই কবিরা সেগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তখনই তার ভিতরে এসেছে বেশ কিছু পরিবর্তন। সেই সময়কার বাংলার ছবি ফুটে উঠেছে ঐ অনুবাদ গুলিতে। বাল্মীকির লেখা রামায়ণের রাম আর কৃত্তিবাসের রামের চরিত্র অনেক আলাদা।

ছবি ৭.২৭ :

মনসামঙ্গল কাব্যের একটি ছবি। ছবিটিতে বেহুলা মৃত লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভেসে যাচ্ছে।

বলার চেষ্টা ছিল। চণ্ডীদেবীকে নিয়ে লেখা হয়েছিল *চণ্ডীমঙ্গল*। দেবী মনসাকে ঘিরে লেখা হয়েছিল *মনসামঙ্গল*। ধর্মঠাকুর ছিলেন *ধর্মমঙ্গল*-এর কেন্দ্রে। অনেক কবিই মঙ্গলকাব্য লিখেছেন। তবে সবগুলিতেই গল্পের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ দেবী বা দেবতার পুজো করার কথা বলা হয়েছে।

চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতি দেবী-দেবতা সমাজের নীচু তলার মানুষের পুজো পেতেন। তাই এদের নিয়ে লেখা মঙ্গলকাব্যগুলিতে গরিব, সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিও পাওয়া যায়। শিবকে নিয়েও এই সময়ে সাহিত্য লেখা হয়েছে। সেই লেখাগুলিকে *শিবায়ন* বলে। পুরাণে শিব বিষয়ে যে কাহিনি তার সঙ্গে শিব-দুর্গার ঘর-সংসারের কথা জুড়ে শিবায়ন কাব্যগুলি লেখা হয়েছে। গরিব শিব-দুর্গা এবং তাদের জীবনের কথা এসেছে ঐ লেখাগুলিতে। শিব সেখানে চাষবাস করে রোজগারের চেষ্টা করে। এই লেখাগুলিতে সেই সময়ের বাংলার গরিব কৃষক পরিবার যেন শিব-দুর্গার পরিবার হয়ে গেছে।

মনে রেখো

নাথ-সাহিত্যের একটা বিখ্যাত অংশ হলো ময়নামতীর কথা ও গোপীচন্দ্রর গান। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কথা ও গানটি প্রচলিত। এই গল্পটি বাংলা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল বিহার, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে।

নাথ-যোগী নামের এক ধর্ম সম্প্রদায় এই সময়ে বাংলায় ছিল। তাদের দেবতা শিব। এই নাথ-যোগীদের ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণ নিয়েও এই সময়ে সাহিত্য লেখা হয়। তাকে বলে *নাথ সাহিত্য*। এই লেখাগুলিতে সন্ন্যাস-জীবন যাপনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

ভেবে বলোতো, কিভাবে সেই যুগে এই গল্পটি বাংলা থেকে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে?

শ্রীচৈতন্যের জীবন এবং কাজ নিয়ে লেখালেখির ধারা এই সময়ে শুরু হয়। চৈতন্যের জীবনী নিয়ে কাব্য লেখেন অনেক বৈষ্ণব কবি। এগুলিকে *চৈতন্যজীবনীকাব্য* বলা হয়।

আরবি-ফারসির সঙ্গে বাংলা ভাষার মিলমিশ ঘটিয়ে এই সময়ে লেখালেখির ধারা ছিল। সৈয়দ আলাওল এবং দৌলত কাজি সেই ধারার কবি। আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির চিতোর রাজ্য অভিযানের কথা আছে।

৭.৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এক সময়ে অনেকেই ভাবতেন যে প্রাচীনকালই ছিল বিজ্ঞানচর্চা এবং সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টির 'সুবর্ণ যুগ'। তুলনায় মধ্যযুগ হলো ইতিহাসের এক 'অন্ধকার সময়'। তাদের মতে ঐ সময় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতির চাকা প্রায় থেমে যায়। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এখন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আর পাঁচটা সময়ের মতো মধ্যযুগেও ভারতবর্ষ এই সমস্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলো।

বিজ্ঞানে উন্নতির বহু তথ্য আমরা পাই অল বিরুনির *কিতাব-অল হিন্দ*-এ। ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই লেখার মধ্যে দিয়েই তামাম ইসলামি দুনিয়ায় তিনি ছড়িয়ে দেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতের চিন্তাধারা। ঠিক কেমন ছিল বিজ্ঞান নিয়ে তখনকার ভারতীয়দের ভাবনা?

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি ঘটে মধ্যযুগে। এর আরম্ভ সুলতানি আমল থেকে। দিল্লিতে একটা উঁচু মিনারের উপর ফিরোজ শাহ তুঘলক তৈরি করান একটা মানমন্দির। তার উপর বসানো হয় একটা সূর্যঘড়ি। এছাড়া খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে চৈনিক চৌম্বক কম্পাস এর ব্যবহার শুরু হয় ভারতের সামুদ্রিক এলাকাগুলিতে।

মুঘল বাদশাহ আকবর ছিলেন বিজ্ঞান প্রসারের বিষয় খুবই আগ্রহী। তাঁর দরবারে অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হতো। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়—যেমন জিনিসের দাম, জনসংখ্যা, ফুল-ফল, আবহাওয়া, খাজনার হার ইত্যাদির হিসাবপত্র সুষ্ঠুভাবে রাখা হতো। এছাড়া আকবরের রাজসভার ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন যে, শিক্ষিত না হলেও আকবর নিজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে আগ্রহ রাখতেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজও করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গির *তুজুক-ই জাহাঙ্গিরি*-তে উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যার বিষয়ে বেশ কিছু কথা লিখেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন জয়পুরের রাজা সওয়াই জয় সিংহ। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা এবং বারাণসীতে মানমন্দির তৈরি করেন।

মধ্যযুগের ভারতে সুলতানি শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই আমদানি হয় গ্রিকো-আরবি ধারার ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রের। উত্তর ভারত থেকে এই চিকিৎসাপদ্ধতি ক্রমশ অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসাও চালু ছিল সর্বত্র। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের মতো

কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটকের হাত ধরে ইউরোপীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিও ভারতে আসে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে।

সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই সময়ে বড়ো রকমের বদল হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে বারুদ-ব্যবহারকারী আগ্নেয়াস্ত্র চিন থেকে মোঙ্গলদের হাত ঘুরে প্রথমে ভারতে এসে পৌঁছয়। এর কিছু পরে ভারতের কিছু অঞ্চলে শুরু হয় বারুদচালিত রকেটের ব্যবহার। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চিন ও মামেলুক-শাসিত মিশর থেকে বন্দুকের প্রযুক্তি আসে ভারতে। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে পোর্তুগিজরা এই প্রযুক্তি দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে দেয়। এই সময়ের আশেপাশেই মুঘলরাও উত্তর ভারতে যুদ্ধে ব্যাপকহারে বন্দুক ও কামানের ব্যবহার চালু করে। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সময় ঘোড়ার দু-পাশে সৈনিকের পা রাখার জন্য পাদানির (রেকাব) ব্যবহার তুর্কি বাহিনীকে বাড়তি সুবিধা দিত। অশ্বারোহী, পদাতিক এবং রণহস্তীর সঙ্গে এ দেশের রাজা-বাদশাহদের সৈন্যবাহিনীতে ক্রমশ কামান-চালক এবং বন্দুকধারী সৈন্যরা জায়গা করে নিতে থাকে।

ছবি ৭.২৮ :
মুঘলদের রণথম্ভোর দুর্গ অভিযানের একটি ছবি। কামান পাহাড়ি পথে উপরে তোলার জন্য গবাদি পশুর ব্যবহার হতো।

ভারতীয়রা আদিকাল থেকে তালপাতায় কিংবা গাছের ছালে লিখত। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে চিনে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে কাগজ তৈরি করার প্রযুক্তি চিন থেকে প্রথম নিয়ে আসে মধ্য এশিয়ার মোঙ্গলরা। অল্প কিছু কালের মধ্যেই ভারতে কাগজের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে লেখাপড়ার কাজ সহজ হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে ভারতে কাগজ নাকি এতটাই সস্তা হয়ে ছিল যে, ময়রা মিষ্টি দেবার জন্য কাগজ ব্যবহার করতো। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাও করেন ইউরোপীয় মিশনারিরা। বাণিজ্যিকভাবে এই প্রযুক্তির প্রচলনের জন্য অবশ্য আরো বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়।

মধ্যযুগের ভারতে বয়নপ্রযুক্তিতেও (কাপড় বোনা) নানা রকম বদল হয়। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসে পৌঁছয় তুলো বুনবার যন্ত্র 'চরখি'। এই সময় নাগাদই কাপড় বুনবার তাঁতেরও প্রচলন হয়। বিভিন্ন ছবিতে সন্ত কবীরকে তাঁত বুনতে দেখা যায়।

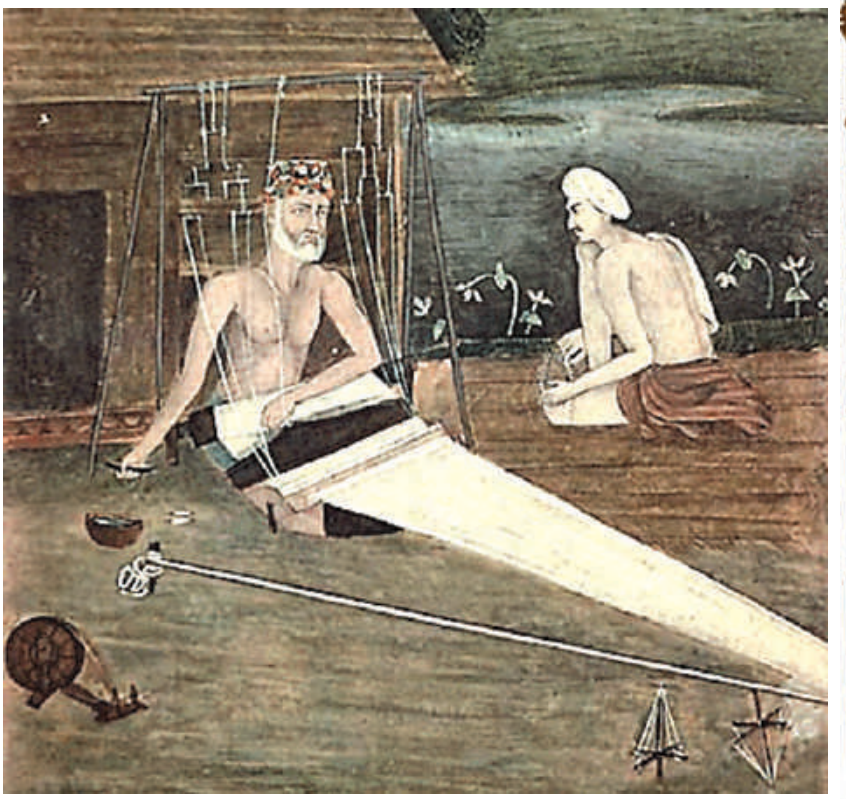

ছবি ৭.২৯:
সন্ত কবীর তাঁত বুনছেন।

এর কিছু পরে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে তুর্কিশাসকদের সঙ্গেই ভারতে আসে চরকা। ভারতে এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই ইসামির *ফুতুহ-উস সালাতিন* বইতে। তুলো থেকে সুতো বোনবার এই প্রযুক্তি দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগীয় ভারতে বস্ত্রশিল্প, বিশেষত কাপড় রং করার এবং ছাপার পদ্ধতি ছিল খুবই উন্নত। নানা ধরনের কাপড় তৈরি হতো ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ভারতে 'ব্লক' ছাপাইয়ের আরম্ভ হয়। এই শিল্প ক্রমশ নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক নাগাদ ছিট (Chintz) ভারতে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে ছাপা কাপড় রপ্তানিও করা হতো।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে ভারতে বিশেষত বাংলায়, রেশমশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। তুঁত গাছের গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি করার প্রযুক্তি এদেশে আসে চিন থেকে। অনেকটা বারুদ ও কাগজের মতোই। এর পর আগামী দুশো বছর ধরে বাংলার মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং কাশিমবাজার অঞ্চল ছিল ভারতের গুটিপোকা চাষের প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে দেশে-বিদেশে রেশম রপ্তানি করা হতো।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে উত্তর ভারতে মুঘলদের হাতে বাগিচাশিল্পের (বাগান তৈরি) ব্যাপক প্রসার ঘটে। প্রাচীনকাল থেকেই যে কলমপ্রথা চলে আসছিল, এই সময়ে এসে তার খুবই উন্নতি লক্ষ করা যায়। পোর্তুগিজদের হাত ধরে এই বিষয়ে কিছু ইউরোপীয় প্রযুক্তিও এই সময়ে ভারতে আসে। এই সব ঘটনার ফলে ভারতের ফলমূলের গুণগত মান এই সময়ে কিছুটা উন্নত হয়েছিল।

ছবি ৭.৩০: চাহার বাগ তৈরির কাজ তদারক করছেন বাদশাহ বাবর।

টুকরো কথা

চাহার বাগ

মুঘলরা খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে ভারতে নিয়ে আসে নতুন এক বাগান বানানোর কৌশল। ফারসিতে এর নাম *চাহার বাগ* (হিন্দিতে চার বাগ)। একটি বাগানকে জল দিয়ে চারটি সমান আয়তনের বর্গে ভাগ করা হতো। তারপর গোটা বাগানে নানরকম ফুলফলের গাছ লাগিয়ে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো। পারস্যে ও মধ্য-এশিয়া থেকে এই বাগান-রীতি মুঘলরা ভারতে নিয়ে আসে। মুঘল বাদশাহদের মধ্যে বাগান করার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ রাখতেন বাবর, জাহাঙ্গির ও শাহজাহান। লাহোরের শালিমার বাগ, কাশ্মীরের নিসাত বাগ, দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধি ও আগ্রাতে তাজমহলে এই চাহার বাগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক নাগাদ পারস্যদেশ থেকে ভারতে আসে বেল্ট এবং গিয়ার-লাগানো সাকিয়া বা পারসিক চক্র (Persian Wheel)। ছোটো নাগরদোলার মতো দেখতে কাঠের তৈরি এই যন্ত্রের মাধ্যমে পশুশক্তির সাহায্যে কুয়ো বা খাল থেকে জল তোলা যেত। তবে যন্ত্রটি দামি হওয়ায় ভারতীয় কৃষকসমাজে এটি খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে এটি ব্যবহার হতো।

কৃষিক্ষেত্রে মধ্যযুগের সবথেকে বড়ো উন্নতির দিক ছিল সেচব্যবস্থার প্রসার। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর শাসকরা এবং উত্তর ভারতে ফিরোজ শাহ তুঘলক এবং মুঘল বাদশাহরা সেচ ব্যবস্থার খুব উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ জমি পাথুরে এবং নদীর সংখ্যা তুলনায় কম হওয়ার ফলে সেচের কাজ করা ছিল কঠিন। এখানে বড়ো মাপের জলাধার খনন করে তার থেকে ছোটো নালা বা খালের মাধ্যমে চাষের জমিতে জল পৌঁছে দেওয়া হতো। অন্যদিকে উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছোটো বড়ো নদীর সংখ্যা অনেক। এই নদীগুলি থেকে খালের মাধ্যমে জল সরাসরি পৌঁছে যেত চাষের জমিতে।

ছবি ৭.৩১ : একটি আধুনিক গিয়ার-লাগানো সাকিয়া বা পারসিক চক্র।

মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি বিকাশের একটি বড়ো ক্ষেত্র ছিল ঘর-বাড়ি নির্মাণশিল্প। সুলতানদের বানানো শহরগুলিতে এর প্রমাণ আছে। বাঁকানো খিলান, গম্বুজ, চুনের ব্যবহার ইত্যাদি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। মুঘল যুগেও এই ধারা বজায় ছিল। এই শিল্পে ভারতীয় কারিগর এবং তুর্কি স্থপতিরা মিলেমিশে ইন্দো-মুসলিম নির্মাণরীতির জন্ম দিয়েছিল।

মধ্যযুগের ভারতে অনেক নতুন প্রযুক্তিই এসেছিল চিন, পারস্য বা ইউরোপের মতো নানা অঞ্চল থেকে। ভারতীয় কারিগরেরা এইসব প্রযুক্তিকে আয়ত্তে আনে সহজেই। কখনওবা এগুলিতে সামান্য পরিবর্তন করে নিজেদের কাজের উপযোগী করে তোলে। তবে এই সময়ের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মৌলিক অবদান বিশেষ দেখা যায় না। খ্রিস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চায় জোয়ার আসে এবং তার ফলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ক্রমশ বড়ো রকমের বদল দেখা যায়। তেমন কিছু আমরা ভারতবর্ষে বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় লক্ষ করি না। এই প্রসঙ্গে ভুললে চলবে না যে, ভূগোল, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিদ্যা এবং সামরিক প্রযুক্তিতে এই সময়ে ইউরোপে, বিশেষত পশ্চিম ইউরোপে, দারুণ অগ্রগতি হয়েছিল। মূলত তারই সুবাদে ইউরোপের পক্ষে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব স্থাপন করা সম্ভব হয়।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১. শূন্যস্থান পূরণ করো:

(ক) _____ (টালি এবং ইঁট/সিমেন্ট এবং বালি/শ্বেতপাথর) ব্যবহার করে বাংলায় সুলতানি এবং মুঘল আমলে সাধারণ লোকের বাড়ি বানানো হতো।

(খ) কবীরের দুই পংক্তির কবিতাগুলিকে বলা হয় _____ (ভজন/কথকথা/দোহা)।

(গ) সুফিরা গুরুকে মনে করত _____ (পির/মুরিদ/বে-শরা)।

(ঘ) _____ (কলকাতা/নবদ্বীপ/মুর্শিদাবাদ) ছিল চৈতন্য-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র।

(ঙ) _____ (নানক/কবীর/মীরাবাঈ) ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা গিরিধারীর সাধিকা।

(চ) দীন-ই ইলাহি-র বৈশিষ্ট্য ছিল মুঘল সম্রাট এবং তাঁর অভিজাতদের মধ্যে _____ (গুরু-শিষ্যের/মালিক-শ্রমিকের/রাজা-প্রজার) সম্পর্ক।

(ছ) শ্বেতপাথরে রত্ন বসিয়ে কারুকার্য করাকে বলে _____ (চাহার বাগ/পিয়েত্রা দুরা/টেরাকোটা)।

(জ) মহাভারতের ফারসি অনুবাদের নাম _____ (হমজানামা/তুতিনামা/রজমনামা)।

(ঝ) (দসবন্ত/মির সঈদ আলি/আবদুস সামাদ) _____ পরিচিত ছিলেন 'শিরিনকলম' নামে।

(ঞ) জৌনপুরি রাগ তৈরি করেন _____ (বৈজু বাওরা/হোসেন শাহ শরকি/ইব্রাহিম শাহ শরকি)।

(ট) শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের লেখকের নাম _____ (কাশীরাম দাস/কৃত্তিবাস ওঝা/মালাধর বসু)।

(ঠ) 'পারসিক চক্র' কাজে লাগানো হতো _____ (জল তোলার জন্য/কামানের গোলা ছোড়ার জন্য/বাগান বানানোর জন্য)।

২. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়?

(ক) বিবৃতি : নদীর ধারে শিল্পগুলি তৈরি হতো।

ব্যাখ্যা-১ : নদীর ধারে শিল্প তৈরি করলে কর লাগতো না।

ব্যাখ্যা-২ : সেকালে সব মানুষই নদীর ধারে থাকতো।

ব্যাখ্যা-৩ : কাঁচা মাল আমদানি এবং তৈরি মাল রপ্তানির সুবিধা হতো।

(খ) বিবৃতি : চৈতন্য বাংলা ভাষাকেই ভক্তি প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-১: তিনি শুধু বাংলা ভাষাই জানতেন।

ব্যাখ্যা-২: সে কালের বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা।

ব্যাখ্যা-৩: ভক্তি বিষয়ক সব বই বাংলায় লেখা হয়েছিল।

(গ) **বিবৃতি :** চিশতি সুফিরা রাজনীতিতে যোগ দিতেন না।

ব্যাখ্যা-১ : তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে ঈশ্বর-সাধনা সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যা-২ : তাঁরা রাজনীতি বুঝতেন না।

ব্যাখ্যা-৩ : তাঁরা মানবদরদী ছিলেন।

(ঘ) **বিবৃতি:** আকবর দীন-ই ইলাহি প্রবর্তন করেন।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি অনুগত গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

(ঙ) **বিবৃতি :** মুঘল সম্রাটরা দুর্গ বানাতে আগ্রহী ছিলেন।

ব্যাখ্যা-১ : দুর্গ বানানোর খরচ ছিল কম।

ব্যাখ্যা-২ : দুর্গ বানানো ছিল প্রাসাদ বানানোর চেয়ে সহজ।

ব্যাখ্যা-৩ : দুর্গ বানানোয় সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হতো।

(চ) **বিবৃতি :** জাহাঙ্গিরের আমলে ইউরোপীয় ছবির প্রভাব মুঘল চিত্রশিল্পে পড়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : এই সময়ে ইউরোপীয় ছবি মুঘল দরবারে আসতে শুরু করেছিল।

ব্যাখ্যা-২ : মুঘল শিল্পীরা সবাই ছিলেন ইউরোপীয়।

ব্যাখ্যা-৩ : ভারতীয় শিল্পীরা এই সময় ইউরোপ থেকে ছবি আঁকা শিখে এসেছিলেন।

(ছ) **বিবৃতি :** মধ্য যুগের মণিপুরী নৃত্যে রাধা-কৃষ্ণ ছিলেন প্রধান চরিত্র।

ব্যাখ্যা-১ : ভারতে নৃত্যের দেব-দেবী হলেন কৃষ্ণ এবং রাধা।

ব্যাখ্যা-২ : এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে বিস্তার লাভ করেছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : চৈতন্যদেব ছিলেন মণিপুরের লোক।

(জ) **বিবৃতি :** ভারতে প্রাচীন কালে তালপাতার উপরে লেখা হতো।

ব্যাখ্যা-১ : সে আমলে কাগজের ব্যবহার জানা ছিল না।

ব্যাখ্যা-২ : সে আমলে ভারতে কাগজের দাম খুব বেশি ছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : সে আমলে ভারতীয়রা কাগজের উপরে লেখার কালি আবিষ্কার করতে পারেনি।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতে কোন কোন ফল, সবজি এবং শস্যের চাষ সবচেয়ে বেশি হতো?

(খ) মধ্য যুগের ভারতে ভক্তি সাধক-সাধিকা কারা ছিলেন?

(গ) সিলসিলা কাকে বলে? চিশতি সুফিদের জীবনযাপন কেমন ছিল?

(ঘ) দীন-ই ইলাহি-র শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কেমন ছিল?

(ঙ) স্থাপত্য হিসাবে আলাই দরওয়াজার বৈশিষ্ট্য কী?

(চ) ক্যালিগ্রাফি এবং মিনিয়েচার বলতে কী বোঝায়?

(ছ) শিবায়ন কী? এর থেকে বাংলার কৃষকের জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

(জ) কাগজ কোথায় আবিষ্কার হয়েছিল? মধ্য যুগের ভারতে কাগজের ব্যবহার কেমন ছিল তা লেখো।